ইনফো
# মেডিকাস
স্বাস্থ্য সাময়িকী

জানুয়ারি ২০২৪ । ১৩তম পর্ব । ২য় সংখ্যা

# সূচী


রোগের ইতিকথা ২
মানবদেহ ৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয় ৫
বিশেষ প্রবন্ধ ৬
জীবাণু পরিচিতি ৯
রোগ ও চিকিৎসা ১০
সাধারণ জিজ্ঞাসা ১২
প্রাথমিক চিকিৎসা ১৩
স্বাস্থ্যকথা ১৪
ইনফো কুইজ ১৫


## সম্পাদক মন্ডলী


এম. মহিবুজ জামান
ডাঃ রুমানা দৌলা
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক
ডাঃ সাইকা বুশরা
ডাঃ মারেফুল ইসলাম মাহী
ডাঃ পার্থ পণ্ডিত সাগর
ডাঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম হিমেল
ডাঃ মোহাম্মদ তকি তাজওয়ার


## ডিজাইন


এসিআই ডিটিপি




# হুপিং কাশি

হুপিং কাশি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এটি পারটুসিস নামে পরিচিত। *বোর্ডেটেলা পারটুসিস (Bordetella pertussis)* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া হুপিং কাশি সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে এই ব্যাকটেরিয়া সুস্থ ব্যক্তিতে ছড়াতে পারে। হালকা কাশি, সর্দি, হাঁচি ও জ্বর এই রোগের লক্ষণ। হুপিং কাশি শিশুদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক, বিশেষ করে ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে। চিকিৎসা না করা হলে নিউমোনিয়া, খিঁচুনি বা মস্তিষ্কের ক্ষতিও হতে পারে। যেহেতু হুপিং কাশির লক্ষণগুলি অনেকটা সর্দি, ফ্লু বা ব্রঙ্কাইটিসের মতো, তাই এটি প্রাথমিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। বেলজিয়ান অণুজীববিজ্ঞানী জুলস্ বোর্ডেট এবং অক্টেভ গেঙ্গো ১৯০৬ সালে হুপিং কাশির জীবাণু *বোর্ডেটেলা পারটুসিস* আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯১৪ সালে সম্পূর্ণ কোষ দিয়ে পারটুসিস ভ্যাক্সিন আবিষ্কৃত হয়। তারপর ১৯৪০-এর দশকে এটি ডিপথেরিয়া এবং টিটেনাস টক্সয়েডের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিটি ভ্যাক্সিন নামকরণ করা হয়। শিশুদের এই ডিপিটি টিকা প্রদানের মাধ্যমে হুপিং কাশিসহ ডিপথেরিয়া এবং টিটেনাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা যায়।

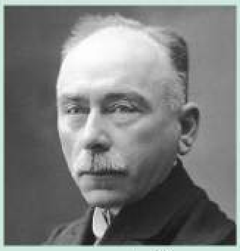

জুলস্ বোর্ডেট
**(Jules Bordet)**
**(১৮৭০-১৯৬১)**

অক্টেভ গেঙ্গো
**(Octave Gengou)**
**(১৮৭৫-১৯৫৭)**

# নাক

নাক শ্বসনতন্ত্রের প্রথম অঙ্গ। নাকের আরেকটি কাজ হলো ঘ্রাণ বা গন্ধের অনুভূতি প্রদান করা। নাকের আকৃতি অনুনাসিক হাড় এবং অনুনাসিক তরুণাস্থি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে নাসামধ্য পর্দা (ন্যাসাল সেপ্টাম) রয়েছে যা নাকের ছিদ্রকে আলাদা করে এবং নাসারন্ধ্রকে দুটি ভাগে ভাগ করে।

### নাকের অংশসমূহ

- **হাড়ঃ** নাকের উপরের শক্ত অংশটি হাড় দিয়ে তৈরি
- **চুল বা সিলিয়াঃ** চুল বা সিলিয়া (ছোট, চুলের মতো গঠন) নাকের ভিতরে ময়লা এবং ধূলিকণা আটকে রাখে
- **পার্শ্বীয় দেয়াল (বাহ্যিক দেয়াল)ঃ** নাকের পার্শ্বীয় দেয়াল তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি এবং ত্বকে আবৃত। দেয়াল অনুনাসিক গহ্বর এবং নাসারন্ধ্র গঠন করে
- **অনুনাসিক গহ্বরঃ** নাকের দুটি অনুনাসিক গহ্বর রয়েছে। এটি ফাঁপা জায়গা যেখানে বাতাস প্রবেশ করে এবং বাইরে প্রবাহিত হয়। এটি শ্লেষ্মা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। ফুসফুসে প্রবেশের আগে বাতাসকে ছেঁকে উষ্ণ ও আর্দ্র করে এটি
- **অলফ্যাক্টরি স্নায়ুঃ** অনুনাসিক গহ্বরের উপরের দিকে ঘ্রাণের জন্য সংবেদী বিশেষ ধরনের স্নায়ু কোষ রয়েছে। গন্ধের অনুভূতি প্রদান করতে মস্তিষ্কের সাথে এই কোষগুলোর সংযোগ থাকে। এদের অলফ্যাক্টরি স্নায়ু বলে
- **নাসারন্ধ্রঃ** এগুলি অনুনাসিক গহ্বরের খোলা অংশ। নাসারন্ধ্র থেকে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত গহ্বরকে নাসাপথ বলে। এটির মাধ্যমে অনুনাসিক গহ্বরে বাতাস চলাচল করে
- **নাসামধ্য পর্দা (ন্যাসাল সেপ্টাম)ঃ** সেপ্টাম হাড় ও শক্ত তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি। এটি দুটি অনুনাসিক গহ্বরকে আলাদা করে। প্রতি পাশে এটি শ্লেষ্মা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এটির হাড় দুইটি হলো ভোমার ও এথময়েড এবং তরুণাস্থি দুইটি হলো সেপ্টাল তরুণাস্থি ও অনুনাসিক তরুণাস্থি। এখানে একটি কৈশিকজালিকার নেটওয়ার্ক থাকে যাকে বলা হয় "কিসেলবাক'স প্লেক্সাস"। এটি "লিটলস এরিয়া" হিসাবেও পরিচিত। এখান থেকে রক্তপাত হতে পারে যাকে বলা হয় এপিস্ট্যাক্সিস

## নাকের অংশসমূহ

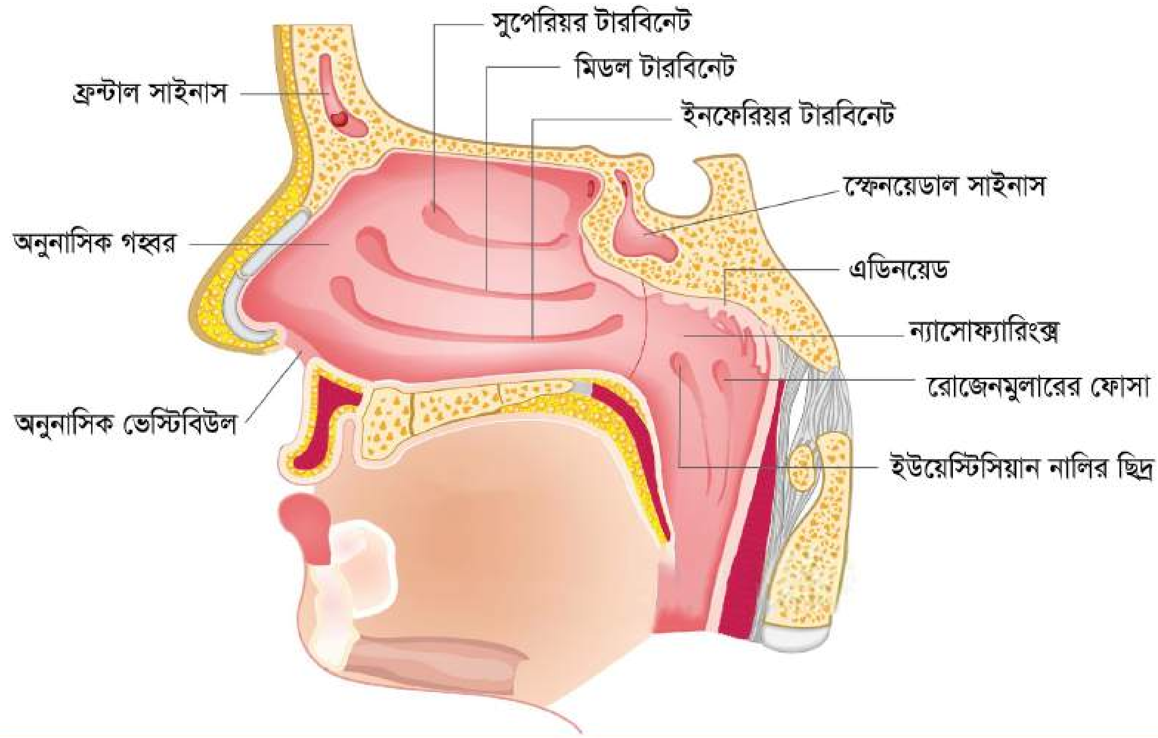


- **প্যারান্যাসাল সাইনাসঃ** অনুনাসিক গহ্বরের চারপাশে বাতাসে ভরা জায়গা হলো প্যারান্যাসাল সাইনাস। এগুলো শ্লেষ্মা তৈরি করে যা নাককে আর্দ্র রাখে। চার জোড়া সাইনাস আছে। এগুলো হলোঃ
    - ফ্রন্টাল সাইনাসঃ ফ্রন্টাল হাড়ের গভীরে থাকে
    - ম্যাক্সিলারি সাইনাসঃ ম্যাক্সিলা হাড়ে থাকে এবং সকল সাইনাসের মধ্যে বৃহত্তম
    - স্ফেনয়েডাল সাইনাসঃ স্ফেনয়েড হাড়ের মধ্যে থাকে। সাইনাস দুইটি ভিন্ন আকৃতির
    - এথময়েডাল সাইনাসঃ এথময়েড হাড়ের মধ্যে থাকে
- **টারবিনেট বা কঙ্কাঃ** উভয় অনুনাসিক গহ্বরের পাশে তিন জোড়া টারবিনেট রয়েছে। এগুলো শ্বাস নেওয়ার পরে বাতাসকে উষ্ণ ও আর্দ্র করতে সহায়তা করে। এদের আলাদা করে রাখে মিয়াটাস

### নাকের কাজ

- **শ্বাস-প্রশ্বাসের মূল মাধ্যমঃ** বাতাস গ্রহণ ও ত্যাগে নাক প্রধান পথ হিসেবে কাজ করে
- **বাতাসকে আর্দ্র করাঃ** আমাদের গলা এবং ফুসফুসের জন্যে যে বাতাস টেনে নিই, তাকে আর্দ্র করে নাক। মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে তা হয় না। এ কারণে দীর্ঘক্ষণ মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে গলা শুকিয়ে যায়
- **বাতাস পরিশুদ্ধ করাঃ** যে বাতাস টেনে নেওয়া হয়, তাতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ধূলাবালি, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি থাকে। নাকের ভেতরের ওপরের দিক ক্ষুদ্র লোমে পূর্ণ থাকে যা বাতাসের অধিকাংশ দূষিত পদার্থ ফিল্টার করে
- **বাতাসের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণঃ** দেহের তাপমাত্রার সঙ্গে গৃহীত বাতাসকে মানানসই করতে কাজ করে নাক
- **গন্ধ শনাক্তকরণঃ** নাকের ভেতরে ওপরের দিকে স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে যা গন্ধ শনাক্ত করে। স্বাদের ক্ষেত্রে গন্ধ বড় ভূমিকা রাখে
- **কণ্ঠকে বৈশিষ্ট্যদানঃ** গলা এবং নাকের কাঠামো মানুষের কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ করে। স্বরযন্ত্রে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাকে সুন্দর ও শ্রবণযোগ্য করে তোলে নাক

### নাকের রোগ

নাকে বিভিন্ন রকমের রোগ হতে পারে। এগুলো হলোঃ

- অ্যালার্জিক রাইনাইটিস
- ডেভিয়েটেড ন্যাসাল সেপ্টাম (নাসামধ্য পর্দার বিচ্যুতি)
- এনলার্জড টারবিনেট (টারবিনেট বড় হয়ে যাওয়া)
- সাইনুসাইটিস
- ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার
- ন্যাসাল পলিপ
- এপিস্ট্যাক্সিস (নাক দিয়ে রক্তপাত)

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

## কোইলোনাইকিয়া

"কোইলোনাইকিয়া" নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ "কোইলোস" থেকে, যার অর্থ ফাঁপা, আর "নাইকিয়া" বলতে নখের অবস্থা বোঝায়। "কোইলোনাইকিয়া" বলতে চামচ আকৃতির ভাঁজ থাকা নরম নখকে বোঝায়। একে "চামচ নখ"-ও বলে। সাধারণত এই "চামচ নখ" ধীরে ধীরে গঠিত হয়। নখ প্রথমে চ্যাপ্টা আকৃতির হয়, তারপর ধীরে ধীরে চামচ আকৃতির ভাঁজ তৈরি হয়। নখের এই অবস্থাকে কোইলোনাইকিয়া বলে। শরীরে আয়রন বা ভিটামিন বি-এর অভাব কিংবা পুষ্টির ঘাটতি থাকলে কোলোনাইকিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

## গ্যাংলিয়ন

গ্যাংলিয়ন হলো এক ধরনের সিস্ট বা ফ্লুইড (তরল পদার্থ)-ভর্তি নরম টিস্যুর পিণ্ড যা শরীরের নির্দিষ্ট অংশের উপর বা তার চারপাশে দেখা যায়। এটি সাধারণত কব্জিতে সবচেয়ে বেশি দেখা গেলেও আঙুল, পা, হাঁটু এবং গোড়ালিতেও এটি দেখা যায়। গ্যাংলিয়ন যদি কোন সমস্যার সৃষ্টি না করে, সাধারণত এটি চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি গ্যাংলিয়ন ব্যথা সৃষ্টি করে বা আশেপাশের অস্থিসন্ধির নড়াচড়াকে প্রভাবিত করে, তাহলে এটির জন্য ২টি প্রধান চিকিৎসা পদ্ধতি হলোঃ একটি সুই বা সিরিঞ্জের সাহায্যে সিস্ট থেকে তরল পদার্থ বের করা (অ্যাসপিরেশন), অথবা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সিস্টটি কেটে ফেলা।

## লোম ফোঁড়া

*স্টেফাইলোকক্কাস* নামক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে লোম গ্রন্থিতে ফোঁড়া হলে তাকে লোম ফোঁড়া (Boils) বলে। লোম ফোঁড়ার লক্ষণগুলো হলো লোম গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, লাল হওয়া, গরম হওয়া, খুব ব্যথা অনুভূত হওয়া। এটিতে সাধারণত একটি মুখ দেখা যায়, আর এই ফোঁড়ার মুখ ছিদ্র করে দিলে পুঁজের সাথে ভেতরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে আসে। কিছু ফোঁড়ার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। অস্ত্রোপচারের পর নিয়মিত ড্রেসিংয়ের মাধ্যমে ফোঁড়া সেরে ওঠে। আবার কখনও কখনও এটির চিকিৎসায় ঔষধেরও প্রয়োজন হয়।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

বিশেষ প্রবন্ধ

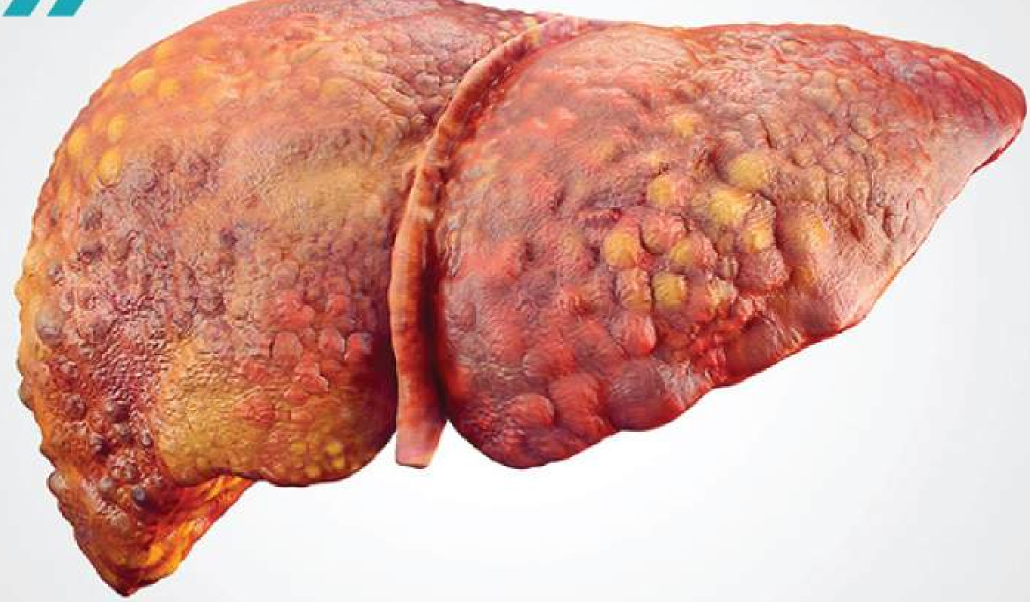

# লিভার সিরোসিস

লিভার সিরোসিস একটি মারাত্মক ও দুরারোগ্য রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হলে যকৃতের ট্রান্সপ্লান্ট বা প্রতিস্থাপন ছাড়া পুরোপুরি আরোগ্য হয় না। এই কারণে রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। লিভার সিরোসিস মানুষের যকৃতের দীর্ঘস্থায়ী রোগের ফল যা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত থেকে সৃষ্টি হতে পারে। মারাত্মক পর্যায়ের সিরোসিসে যকৃতের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। সিরোসিসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে যকৃতের সুস্থ-সবল টিস্যু ক্ষয়যুক্ত টিস্যু বা নডিউল (nodule) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। ফলে যকৃৎ তার স্বাভাবিক কাজগুলো, যেমন বিপাক ক্রিয়া, রক্ত জমাট বাঁধার উপকরণ তৈরি, ওষুধ ও রাসায়নিক পদার্থের শোষণ, খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি করতে পারে না। এই রোগ হলে যকৃতে সূক্ষ্ম সুতার জালের মতো ফাইব্রোসিস হয়। এতে তখন ছোট ছোট দানা সৃষ্টি হয়। আস্তে আস্তে সেটির বিস্তার ঘটতে থাকে। ফাইব্রোসিস ছড়িয়ে পড়লে সেখানে আর যকৃৎ নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে না, ফলে এটি সংকুচিত হয়ে পড়ে।

### প্রকারভেদ

নডিউলের আকার-আকৃতির উপর ভিত্তি করে লিভার সিরোসিস ৩ ধরনের হয়ে থাকে-

১। মাইক্রোনডিউলার সিরোসিস (একই আকৃতির নডিউল থাকে যাদের ব্যাস ৩ মি.মি.-এর কম)

২। ম্যাক্রোনডিউলার সিরোসিস (বিভিন্ন আকৃতির নডিউল থাকে যাদের ব্যাস ৩ মি.মি.-এর বেশি)

৩। মিশ্র (যখন মাইক্রোনডিউলার এবং ম্যাক্রোনডিউলার সিরোসিস উভয়ের বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত থাকে)

### ধাপসমূহ

সুস্থ লিভার
↓
ফ্যাটি লিভার
↓
ফাইব্রোসিস
↓
সিরোসিস

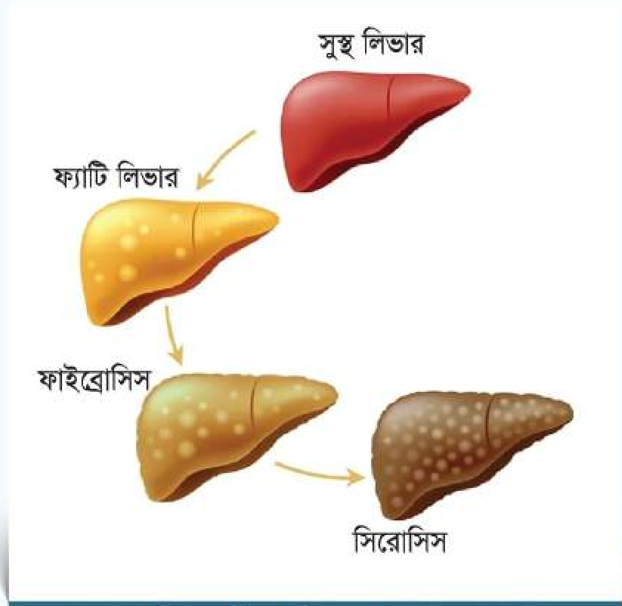


লিভার সিরোসিসের ধাপসমূহ

## কারণ

বিভিন্ন কারণে লিভার সিরোসিস রোগ হতে পারে। যেমনঃ

- হেপাটাইটিস বি, সি এবং ডি ভাইরাসের আক্রমণে লিভারে প্রদাহের তৈরি হয়। লিভারে প্রদাহের তৈরি করে বলেই একে বলা হয় হেপাটাইটিস। যার ফলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে বি ও সি ভাইরাসের আক্রমণে লিভার বা যকৃতের কার্যক্ষমতা কমে যায়, কার্যক্রম আস্তে আস্তে ব্যাহত হয়। এরপর এটি লিভার সিরোসিসে রূপ নেয়
- লিভার সিরোসিসের আরও একটি বড় কারণ হলো ফ্যাটি লিভার বা যকৃতে চর্বি জমে যাওয়া। দীর্ঘদিন ধরে লিভারে যদি মাত্রাতিরিক্ত চর্বি জমে, তাহলে লিভারের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এক সময় এর ফলেও লিভার সিরোসিস হতে পারে
- এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, স্থূলতা, খাদ্যাভ্যাস, রক্তে কোলেস্টেরল ইত্যাদি কারণে ফ্যাটি লিভার হতে পারে। অতিরিক্ত মদ্যপান, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অতিরিক্ত ঔষধ সেবন, রাস্তাঘাটে বিক্রি হওয়া দূষিত পানীয়, ব্যবহার করা বরফ, খোলা শরবত বা ফলের মাধ্যমে যকৃতের রোগ ছড়াতে পারে
- ভাইরাস বা অ্যালকোহলের পরিবর্তে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি যকৃতের ক্ষতি করে, তাকে অটোইমিউন হেপাটাইটিস বলে। এটি অন্যান্য হেপাটাইটিসের মতোই যকৃতে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ সৃষ্টি করে
- যখন পিত্তনালী ফুলে যায় বা স্ফীত হয়, তখন এটি পিত্ত প্রবাহকে বাধা দেয়। এই পরিবর্তনের কারণে যকৃতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। তখন একে বিলিয়ারি সিরোসিস বলা হয়। এটি লিভার সিরোসিসের অন্যতম কারণ

## লক্ষণ

লিভার সিরোসিসের শুরুর দিকে তেমন উপসর্গ থাকে না। অনেক সময় পেটের আল্ট্রাসাউন্ড কিংবা পেটে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে এই রোগটি ধরা পড়ে।

লিভার সিরোসিসের লক্ষণগুলো হলোঃ

- জন্ডিস
- শারীরিক দুর্বলতা
- খাবারে অরুচি
- পেটে অস্বস্তি
- ওজন কমে যাওয়া
- অবসাদ
- অ্যাসাইটিস
- ইডিমা
- বমি বমি ভাব
- স্পাইডার এনজিওমা (মাকড়সার মতো শিরা)

লিভার সিরোসিসের লক্ষণ

## ঝুঁকির কারণ

লিভারের সিরোসিসের ঝুঁকির অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলোঃ

- সিস্টিক ফাইব্রোসিস
- শরীরে আয়রন বেশি তৈরি হওয়া
- উইলসন'স ডিজিজ
- অটোইমিউন হেপাটাইটিস
- জিনগত হজম সমস্যা
- গ্যালাক্টোসেমিয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পিত্তনালী
- হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি

## পরীক্ষা

সিরোসিসের প্রথম পর্যায়ে সাধারণত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়। যদি সন্দেহ করা হয় যে সিরোসিস আছে, তাহলে নিম্নোক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারেঃ

- লিভারের কার্যকারিতা পরীক্ষা
- কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা
- হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পরীক্ষা
- হেপাটাইটিস সি ভাইরাস পরীক্ষা
- রক্ত জমাট বাঁধার ফ্যাক্টর পরীক্ষা

এছাড়া লিভার সিরোসিস নির্ণয়ের জন্য আরও অন্যান্য পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে, যেমনঃ

- সিটি স্ক্যান
- আল্ট্রাসাউন্ড
- রেডিওআইসোটোপ লিভার স্ক্যান
- রেডিওআইসোটোপ প্লীহা স্ক্যান
- বায়োপসি
- এমআরআই

## চিকিৎসা

লিভার সিরোসিস হলে সারা জীবন বহন করতে হয়, পুরোপুরি আরোগ্য লাভ হয় না। তবে সঠিক চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জটিলতা দূর করা যেতে পারে। বর্তমানে বিশ্বে লিভার সিরোসিসের অনেক আধুনিক চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয়েছে। এই রোগের ক্ষেত্রে সর্বশেষ চিকিৎসা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বা যকৃত প্রতিস্থাপন। বাংলাদেশেই এখন যকৃতের প্রতিস্থাপন সম্ভব হচ্ছে।

## প্রতিরোধ

যকৃতের রোগে চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন উপায়ে লিভার সিরোসিস প্রতিরোধ করা যায়, যেমনঃ

- হেপাটাইটিস বি'র ক্ষেত্রে শিশুদের জন্মের পরপরই টিকা দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও এই রোগের টিকা আছে
- এক রেজরে একাধিক ব্যক্তির শেভ না করা, রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা পরীক্ষা করে নেয়া, অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক পরিহার করা, ইত্যাদির মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি ও সি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব
- দূষিত পানি, অতিরিক্ত মদ্যপান, খোলা ফলমূল ও খোলা খাবার এড়িয়ে চলতে হবে
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, শারীরিক পরিশ্রম করা, ওজন নিয়ন্ত্রণে আনা, কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনা, স্থূলতা দূর করা ইত্যাদির মাধ্যমে লিভার সিরোসিসের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়

## জটিলতা

- **ভ্যারিসিয়াল রক্তপাতঃ** এটি পোর্টাল হাইপারটেনশনের কারণে ঘটে, যেখানে পোর্টাল শিরার (যকৃতের সাথে পরিপাক অঙ্গের সংযোগকারী রক্তনালী) মধ্যে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এই রক্তনালীতে উচ্চচাপের কারণে সহজে রক্তপাত হয়, যার ফলে গুরুতর রক্তপাত হয়ে পেটে তরল পদার্থ জমে, যাকে অ্যাসাইটিস বলে
- **হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথিঃ** শরীরে উৎপন্ন বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ সাধারণত লিভার দ্বারা বিষমুক্ত হয়। কিন্তু একবার সিরোসিস হলে লিভার তা করতে পারে না। তাই এগুলো রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে বিভ্রান্তি, আচরণে পরিবর্তন করতে পারে এবং এমনকি রোগী কোমায় চলে যেতে পারে
- **ইডিমা**
- **অ্যাসাইটিস**
- **স্প্লেনোমেগালি**
- **লিভার ক্যান্সার**

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# প্লাজমোডিয়াম

### বৈশিষ্ট্য

- প্লাজমোডিয়াম এককোষী জীবাণু
- এগুলো মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং পোকামাকড়ের পরজীবী
- এগুলো প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়
- এদের প্রধান কয়েকটি প্রজাতি হলো *প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম*, *প্লাজমোডিয়াম ওভালি*, *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স* এবং *প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি*
- এরা অ্যানোফিলিস মশাকে ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করে
- জীবন চক্র সম্পন্ন করতে এদের দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়, যথা-মানুষ ও মশকী

### যে রোগ করে

প্লাজমোডিয়াম মানুষের ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী।

### প্লাজমোডিয়ামের সংক্রমণ

সংক্রামিত স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে প্লাজমোডিয়ামের সংক্রামক রূপ (স্পোরোজয়েট) মানবদেহে স্থানান্তর হয়।

স্পোরোজয়েট লিভার কোষে পৌঁছে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং মেরোজয়েটে পরিণত হয়।

মেরোজয়েট লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করে এবং ট্রফোজয়েটে পরিণত হয়।

ট্রফোজয়েট লোহিত রক্তকণিকায় পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট তৈরি করে।

গ্যামেট লোহিত রক্তকণিকা ফেটে বের হয়ে হিমোজাইন টক্সিন নির্গত করে যা জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা ও কাঁপুনির জন্য দায়ী।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজ

হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজ হলো এক ধরনের রোগ যা হাত, পা ও মুখে ফোসকা এবং ঘা সৃষ্টি করে। এটি প্রায়ই ছোট শিশুদের হয়ে থাকে। এটি অত্যন্ত সংক্রামক। এটি এন্টেরোভাইরাস (Enterovirus) বংশের ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট, সাধারণত কক্সস্যাকিভাইরাস (Coxsackievirus)। এই ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটি আক্রান্ত ব্যক্তির লালা, মল বা শ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায়। এটি সব বয়সের মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে, তবে ৫ বছরের কম বয়সী এবং শিশু দিবাযত্নকেন্দ্রের শিশুদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। কারণ ছোট বাচ্চাদের ঘন ঘন ডায়াপার পরিবর্তন করতে হয় এবং টয়লেট ব্যবহার করতে সাহায্য করতে হয়। তাদের মুখে হাত দেওয়ার প্রবণতাও বেশি। এই রোগ হওয়ার প্রথম সপ্তাহে শিশু সবচেয়ে বেশি সংক্রামক হয়। কিন্তু লক্ষণগুলো চলে যাওয়ার পরও ভাইরাসটি কয়েক সপ্তাহ শরীরে থাকতে পারে। তাই ঐ শিশু তখনও অন্যদের সংক্রমিত করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে। এই রোগ সাধারণত কয়েক দিনের মধ্যে নিজেই সেরে যায়।

**লক্ষণ**

প্রথম সংক্রমণের ৩-৬ দিন পরে লক্ষণগুলি প্রকাশ শুরু করে। এই সময়কাল ইনকিউবেশন পিরিয়ড নামে পরিচিত। লক্ষণগুলি হলোঃ

- জ্বর
- সর্দি
- ক্ষুধা হ্রাস
- গলা ব্যথা
- মাথা ব্যথা
- বিরক্তি
- অস্বস্তি
- মুখে ব্যথাযুক্ত লাল ফোসকা
- লালা বেয়ে পড়া
- হাত এবং পায়ের তলায় লাল ফুসকুড়ি
- মাংসপেশিতে ব্যথা
- পেটে ব্যথা
- বমি
- ডায়রিয়া

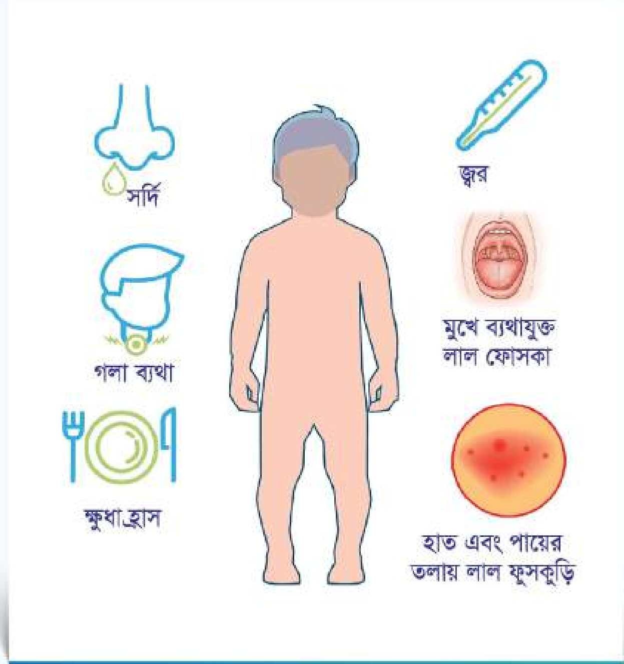


হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজ-এর লক্ষণ

জ্বর এবং গলা ব্যথা সাধারণত এই রোগের প্রথম লক্ষণ। সাধারণত জ্বর শুরু হওয়ার ১ বা ২ দিন পরে ফোসকা ও ফুসকুড়ি দেখা যায়। ফুসকুড়ি সাধারণত চ্যাপ্টা লাল দাগের মতো দেখায়। গাঢ় রঙের ত্বকে এগুলো সহজে দেখা যায় না, হাতের তালু এবং পায়ের তলায় সহজে দেখা যায়। হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজে আক্রান্ত বেশিরভাগ শিশুর মুখে ব্যথাযুক্ত লাল ফোসকা থাকে।

## ঝুঁকি

ছোট বাচ্চাদের হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। শিশুরা সাধারণত এই রোগের ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার পরে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। এই কারণেই এই রোগ ১০ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের খুব কমই প্রভাবিত করে। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যেসব বাচ্চারা বেড়ে ওঠে তাদের এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাছাড়া আক্রান্ত বাচ্চার সংস্পর্শে এলে কিংবা ওই বাচ্চার সাথে খেলাধুলা করলেও এই রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বড় বাচ্চাদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সংক্রমণ হওয়াও সম্ভব যদি তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে থাকে।

## পরীক্ষা

শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে ফোসকা ও ফুসকুড়ি দেখে হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজ নির্ণয় করা যায়। ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করার জন্য গলা বা মলের নমুনা নিয়ে কালচার করা হয়।

## চিকিৎসা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি ৭-১০ দিনের মধ্যে চিকিৎসা ছাড়াই সেরে যায়। এই রোগে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কাজ করে না কারণ এটি ভাইরাসঘটিত রোগ। লক্ষণগুলো উপশম করার জন্য ব্যথানাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ব্যথানাশক ওষুধ হিসেবে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া উচিত নয়। অ্যাসপিরিন ব্যবহার করলে শিশুদের মধ্যে রেয়ে'স সিনড্রোম (মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠনগত ত্রুটি যার কারণে লিভারের ক্ষতি হয় ও মস্তিষ্ক ফুলে যায়) হতে পারে। গলা ব্যথা কমাতে লবণযুক্ত পানি দিয়ে গার্গল করা যেতে পারে। মশলাদার খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এগুলো ঘায়ের ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে।

## জটিলতা

হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজের জটিলতাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- পানিশূন্যতা
- হাত বা পায়ের নখের ক্ষতি
- ভাইরাল মেনিনজাইটিস
- এনসেফালাইটিস
- পক্ষাঘাত
- মায়োকার্ডাইটিস
- এন্টেরাইটিস
- পালমোনারি ইডিমা
- নিউমোনিয়া
- হেমোরেজিক কনজাংক্টিভাইটিস

## প্রতিরোধ

হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজ সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলো অত্যন্ত সংক্রামক। স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করা হ্যান্ড ফুট মাউথ ডিজিজের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা। নিম্নলিখিত পন্থাসমূহ অবলম্বন করে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভবঃ

- নিয়মিত হাত ধোয়া
- শিশুরা যেন তাদের হাত বা অন্যান্য জিনিস তাদের মুখে বা মুখের কাছে না রাখে সেদিকে লক্ষ্য রাখা
- নিয়মিতভাবে বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা
- শিশুর জামাকাপড়, বিছানাপত্র ও অন্যান্য বস্তু পরিচ্ছন্ন রাখা
- শিশুর খেলনা ও অন্যান্য বস্তু যা ভাইরাস দ্বারা দূষিত হতে পারে, সেগুলো জীবাণুমুক্ত রাখা
- আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

## লালশাক খেলে কি শরীরের রক্ত বাড়ে?

লালশাকের মধ্যে ৮৮% জলীয় অংশ ও ১.৬% খনিজ উপাদান থাকে। এই খনিজ উপাদানগুলোর মধ্যে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিংক, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২, ভিটামিন সি, প্রচুর ক্যারোটিন এবং কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উল্লেখযোগ্য। এই শাকে প্রচুর আয়রন থাকায় নিয়মিত খেলে এটি রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়িয়ে রক্তশূন্যতা দূর করে। এছাড়া এ শাকের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। এটি রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। মানবদেহের দাঁত ও অস্থি গঠনে, দাঁতের মাড়ির সুস্থতা রক্ষায় এবং মস্তিষ্কের বিকাশে লালশাকের কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। চোখ ভালো রাখতে লালশাকের ক্যারোটিন বেশ উপকারী। এ শাকের আঁশ বা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

## ক্যান্সার মানেই কি মৃত্যু?

ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ। অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সারের সঠিক কোনো কারণ জানা যায় না। তবে ক্যান্সারের ঝুঁকির কিছু কারণ রয়েছে। এগুলো হলোঃ ধূমপান, জর্দা, সাদাপাতা, গুল ইত্যাদির ব্যবহার, শিশুদের বুকের দুধ কম দেওয়া, তৈলাক্ত খাবার, অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড ইত্যাদি খাওয়া, বিভিন্ন জীবাণু ও ভাইরাসজনিত রোগ যা খাদ্য, পানীয় ও রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে ক্যান্সার মানেই মৃত্যু নয়, প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় এবং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা গেলে জীবন বাঁচানো সম্ভব। ক্যান্সার প্রতিরোধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। তাই শাকসবজি ও ফলমূল বেশি করে খেতে হবে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, প্রতিদিন হাঁটাচলা ও ব্যায়াম করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

## ছোট মাছ কি দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে?

ছোট মাছ নিয়মিত খেলে দৃষ্টিশক্তি ভাল হয়। ছোট মাছের মাথা চোখের জ্যোতি বাড়াতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ছোট মাছে ভিটামিন এ এবং প্রোটিন থাকে যা চোখের নতুন কোষ তৈরি করতে সহায়ক এবং এতে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতিও দ্রুত মেটে। ছোট মাছ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও পেশির জোর বাড়ায়। এছাড়াও এই মাছে প্রচুর ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম থাকে যা হাড় শক্ত ও মজবুত করে। তাছাড়া ছোট মাছের মাথা স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতাও বাড়ায়।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# সাপে কাটা

গ্রামীণ জীবনে সাপে কাটার বিষয়টি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাধারণত মে থেকে অক্টোবর মাসে এটি বেড়ে যায়। তবে সাপে কাটলেই বিষক্রিয়া হয় না। বাংলাদেশে বিষধর সাপের চেয়ে নির্বিষ সাপের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু অনেক সময় অপচিকিৎসা ও অজ্ঞতার কারণে আক্রান্ত রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয় না। সাপে কাটলে হাসপাতালে নেওয়ার আগে প্রাথমিকভাবে যা করতে হবেঃ

- রোগীকে শুইয়ে দিতে হবে, যাতে আক্রান্ত অঙ্গ নড়াচড়া না হয়। কপালে দংশন হলে বসিয়ে রাখতে হবে, হাঁটা যাবে না। হাতে বা পায়ে দংশনে হাত বা পা নড়াচড়া করা যাবে না
- দংশিত স্থানে বিষদাঁতের ক্ষতচিহ্ন আছে কি না দেখতে হবে। ক্ষতস্থান শুধু ভেজা কাপড় দিয়ে কিংবা জীবাণুনাশক লোশন/মলম দিয়ে একবার মুছে নিতে হবে। এরপর ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দংশিত অঙ্গ থেকে আংটি, চুড়ি, তাবিজ, তাগা খুলে ফেলতে হবে। কারণ দংশিত অঙ্গ ফুলে গেলে পরবর্তী সময়ে এগুলো খুলতে অসুবিধা হবে এবং রক্ত চলাচল ব্যাহত হবে
- রক্তক্ষরণ হতে থাকলে ক্ষতস্থানে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। দংশিত অঙ্গ (হাত-পা) স্প্লিন্ট/চ্যাপ্টা বাঁশের চেলা এবং ব্যান্ডেজ/লম্বা কাপড়, যেমন-গামছা, ওড়না ইত্যাদি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এমনভাবে বাঁধতে হবে যেন বাঁধন অনেক বেশি শক্ত অথবা ঢিলা না হয়, বাঁধনের নিচ দিয়ে যাতে দুটি আঙুল ঢোকানো যায়। এটি যেমন বিষের প্রবাহের বাধা দিতে যথেষ্ট কার্যকর হবে, তেমনি রক্ত চলাচলও স্বাভাবিক থাকবে
- রোগীকে এক পাশ কাত করে রাখতে হবে যাতে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকে
- রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে
- কেউ যদি সাপটিকে মেরে থাকে, হাসপাতালে যাওয়ার সময় শনাক্তকরণের জন্য তা নিয়ে যেতে হবে। তবে সাপ মারা ও ধরার জন্য অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# নাক ডাকা বন্ধের উপায়

মাঝবয়সী ও বয়স্ক পুরুষদের অনেকেই নাক ডাকা সমস্যায় ভোগেন। চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে অল্পবিস্তর নাক ডাকা তেমন ক্ষতিকারক নয়। বাচ্চাদের নাক ডাকা সব সময়ই অস্বাভাবিক, যা সাধারণত বিভিন্ন রোগের কারণে হয়ে থাকে। নাক ডাকা মারাত্মক হলে ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে বা শ্বাস নেয়ার জন্য হাঁসফাঁস করে, এটিকে স্লিপ এপনিয়া সিনড্রোম বলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি শ্বাসের রাস্তায় বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে, তখন এটিকে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এপনিয়া বলে। নাক ডাকা বন্ধে নিম্নলিখিত উপায়গুলো মেনে চলার চেষ্টা করা যেতে পারেঃ

১) কাত হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে হবে।

২) ওজন বেশি হলে ওজন কমাতে হবে।

৩) ধূমপান, নেশাজাতীয় দ্রব্য ও ঘুমের ওষুধ পরিহার করতে হবে।

৪) বুকের চেয়ে মাথা উঁচু করে শুতে হবে।

৫) নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করতে হবে।

৬) নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে।

৭) পরিমাণমতো পানি পান করতে হবে।

৮) নাসারন্ধ্র পরিষ্কার রাখতে হবে।

এগুলো মেনে চলেও যদি নাক ডাকা কমানো না যায়, তবে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ **'লিভার সিরোসিস'** থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত ইনফো কুইজ কার্ডটি আগামী ৩১ মার্চ ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে আপনার নিকটস্থ আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করুন।

**১) ফ্যাটি লিভার বলতে কি বুঝায়?**

ক) যকৃৎ আকারে বড় হয়ে যাওয়া
খ) যকৃতে চর্বি জমা
গ) যকৃতের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া
ঘ) কোনটি নয়

**২) নিচের কোনটি লিভার বা যকৃতের স্বাভাবিক কাজ নয়?**

ক) বিপাক ক্রিয়া
খ) ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থের শোষণ
গ) খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের ব্যবস্থাপনা
ঘ) খাদ্য পরিপাক

**৩) লিভার সিরোসিস হলে কি হয়?**

ক) যকৃতে ফাইব্রোসিসের বিস্তার ঘটে
খ) যকৃতে পচন ধরে
গ) যকৃৎ বড় হয়ে যায়
ঘ) যকৃতের কিছুই হয় না

**৪) লিভার বা যকৃতে প্রদাহ তৈরি হয় নিচের কোন ভাইরাসের আক্রমণে?**

ক) হেপাটাইটিস বি ভাইরাস
খ) হেপাটাইটিস সি ভাইরাস
গ) হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস
ঘ) সবগুলো

**৫) নিচের কোন চিকিৎসা ছাড়া লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হলে পুরোপুরি আরোগ্য হয় না?**

ক) ঔষধ
খ) যকৃত ট্রান্সপ্লান্ট/প্রতিস্থাপন
গ) জীবনযাত্রা পরিবর্তন
ঘ) টিকা

**৬) যকৃতের রোগের লক্ষণ নিচের কোনটি?**

ক) শ্বাসকষ্ট
খ) জন্ডিস
গ) ঘন ঘন মাথা ব্যাথা
ঘ) পায়খানার সাথে রক্তপাত

**৭) হেপাটাইটিস বি'র ক্ষেত্রে শিশুদের কি করতে হবে?**

ক) মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে
খ) ঔষধ খাওয়াতে হবে
গ) টিকা দিতে হবে
ঘ) সবগুলো

**৮) লিভার সিরোসিসের ঝুঁকির কারণ নয় কোনটি?**

ক) পেটে আলসার
খ) গ্যালাক্টোসেমিয়া
গ) সিস্টিক ফাইব্রোসিস
ঘ) শরীরে আয়রন বেশি তৈরি হওয়া

**৯) লিভার সিরোসিস রোগ নির্ণয়ে নিচের কোন পরীক্ষাটি করা হয় না?**

ক) এক্সরে
খ) এমআরআই
গ) সিটি স্ক্যান
ঘ) আল্ট্রাসাউন্ড

**১০) ভ্যারিসিয়াল রক্তপাত কোনটির কারণে ঘটে?**

ক) ফ্যাটি লিভার
খ) পোর্টাল হাইপারটেনশন
গ) পিত্তথলির পাথর
ঘ) ডায়াবেটিস

জানুয়ারি ২০২৪
১৩তম পর্ব । ২য় সংখ্যা

ইনফো
মেডিকাস
স্বাস্থ্য সাময়িকী

# ইনফো কুইজ কার্ড

এ এম এম টেরিটোরি কোড ------------------

নাম ____________________

যোগ্যতা ____________________

ঠিকানা ____________________

____________________

____________________

মোবাইল নং ____________________

| আপনার লিখিত এসিআই এর ওষুধ | |
|---|---|
| নং | নাম |
| ১ | |
| ২ | |
| ৩ | |
| ৪ | |
| ৫ | |
| ৬ | |
| ৭ | |
| ৮ | |
| ৯ | |
| ১০ | |

## জিজ্ঞাসা

এসিআই এর পণ্য বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য নিচের অংশে লিখুন।

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন এবং কার্ডটি ৩১ মার্চ ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করুন।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রশ্নঃ ১ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ২ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ৩ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ৪ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ৫ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ৬ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ৭ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ৮ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ৯ | ক | খ | গ | ঘ |
| প্রশ্নঃ ১০ | ক | খ | গ | ঘ |

ACI

এডভান্সড কেমিক্যাল
ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট, এডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৮৯ গুলশান এভিনিউ, সিম্পলট্রি আনারকলি, ঢাকা-১২১২

P235048